বিমূর্ততা : ইতিহাসের বন্ধন ও মুক্তি

শ্যামলী সুর

যদিও ইতিহাস ও বিমূর্ততা, ইতিহাস ও তত্ত্বের সম্পর্ক বহুদিনের—এই সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ থেকেছে দার্শনিকের চিন্তাপ্রক্রিয়ায় ও ইতিহাসবিদ্যার প্রাঙ্গণে। ইতিহাসের দর্শন থেকে গিয়েছে নিতান্ত অবহেলিত বা সুদূর।

প্রশ্ন হল আমরা প্রাত্যহিক ইতিহাস পঠন-পাঠনে বিমূর্তায়নকে কোন্ কাজে লাগাই? বন্ধনের না মুক্তির? কালানুক্রমের বন্ধন—বিষয়ানুগতার বন্ধন-এ বাঁধা পড়ে থাকে ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাসের যে-বিষয়ীগত রূপ সাহিত্যিকের, শিল্পীর ও ভাবুকের বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত তার সঙ্গে আমাদের প্রথাগত ইতিহাসের বড় একটা সম্পর্ক নেই। আমাদের প্রশ্ন এই যে কালচেতনার বহুমাত্রিক, জটিল ও বিচিত্র যাত্রা কি প্রথানুগ ইতিহাসের ক্ষেত্রে একেবারে অপাংক্তেয় হয়েই থাকবে?

প্রচলিত ইতিহাস পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে বিমূর্তায়নের দু / এক ধরনের ব্যবহার আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

প্রথমেই ধরা যাক কালানুক্রমের বিষয়টি। ইতিহাস পড়াতে গেলে আমাদের

বেছে নিতে হয় একটি বিশেষ কালপর্বকে। কিন্তু এই কালপর্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রেও একটি বিমূর্তায়ন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকে। শুরুতে আমরা ইতিহাস সম্পর্কে একটি সাধারণ বা বিশেষ ধারণা দাঁড় করাই। তারপর সেই নকশাকে ঐতিহাসিক ঘটনা-পঞ্জীর ওপর চাপিয়ে দিই। এক্ষেত্রে আবার পশ্চিমী কালানুক্রমের ধারণাকেই আমরা কম / বেশি অনুসরণ করে চলেছি। ইংরেজ আমলে ঔপনিবেশিক ইতিহাসতত্ত্বে শাসকদের ধর্ম অনুসারে ভারতবর্ষের ইতিহাস বিভক্ত হয়েছিল তিনটি যুগে : হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ এবং ব্রিটিশ যুগ। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরেও এই ধর্মভিত্তিক পর্ববিভাজন নাম পাল্টে থেকে গেল। এক্ষেত্রেও ইতিহাসের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ সংক্রান্ত পাশ্চাত্য ধারণাগুলিকেই আমরা গ্রহণ করেছি, যদিও পাশ্চাত্য পর্ববিভাজন তথা পাশ্চাত্য সমাজ-বাস্তব কোনোমতেই আমাদের দেশীয় সমাজ-বাস্তবের সঙ্গে মেলে না।

অধুনা যখন 'আধুনিকতা'র সংজ্ঞাটির সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই নানান প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে, তখন এই আধুনিকতায় উত্তরণ অগ্রগমন না পশ্চাদ্‌গমন তাও ভেবে দেখা দরকার।

অন্য একটি প্রবণতা হল বিষয়-কেন্দ্রিক ইতিহাস আলোচনা— অর্থাৎ অর্থনৈতিক ইতিহাস, রাজনৈতিক ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস বা সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রভৃতি এক একটি বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত ইতিহাস। এক্ষেত্রেও আবার মানুষকে একমাত্রিক জীব হিসেবে ধরে নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করা হয়। হয় সে অর্থনৈতিক প্রাণী, নয় সে সামাজিক প্রাণী। মানুষের সামগ্রিক অস্তিত্বকে এক বিমূর্তায়নের প্রক্রিয়ায় ছোট ছোট খণ্ডে ভেঙে ফেলা হয়।

কিন্তু মানুষ তো বিচিত্র প্রাণী। তার বাঁচার নানান মাত্রা।

আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদ্যার প্রভাবে যুক্তিবাদ তথা জ্ঞানদীপ্তি-শিল্পায়ন-আধুনিকতার সর্বজনীন মাপকাঠিতে সারা পৃথিবীর ইতিহাসকে বিমূর্ত ছকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা চলে আসছে। ইতিহাস অনন্ত প্রগতির ইতিহাস— তা যেন এক একমাত্রিক সরলরেখার বিবর্তনমাত্র। মাঝে মাঝে পাশ্চাত্য ইতিহাসের চৌহদ্দির মধ্যেই এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটেছিল যা এই প্রগতির ধারণার পক্ষে অন্তরায়— যেমন সাম্রাজ্যবাদ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, নাৎসীবাদের উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং শেষত যুদ্ধোত্তর ঠাণ্ডালড়াই। কিন্তু উপরোক্ত ঘটনাপ্রবাহের বিকৃতিকে সাময়িক ত্রুটি বলে পাশ কাটিয়ে একদিকে কম্যুনিস্ট বিপ্লবগুলি এবং অন্যদিকে আন্তর্জাতিক জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীকে প্রগতির পথে যাত্রা বলে মনে করা হয়েছিল। আর এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নতিশীল দেশগুলির ইতিহাস রয়ে গেল মূল চৌহদ্দির বাইরে। সেই দেশগুলির ইতিহাস হল পাশ্চাত্য প্রগতির বিকৃত বা পিছিয়ে-পড়া রূপ। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাইরের যে-কোনও সভ্যতাই হল নৃতত্ত্বের বিষয়। পাশ্চাত্য : বিষয়ী, প্রাচ্য : বিষয় — পাশ্চাত্য : আত্ম, প্রাচ্য : পর।

একবিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে ইতিহাসের এই সর্বজনীন কাঠামোকে নানান ধরনের

সমালোচনা ও আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ফলে বিভিন্ন সমালোচনার দিক থেকে ইতিহাসচর্চার কতকগুলি বিকল্প রূপও ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

লুসিয়েন ফেভ্‌রে (Lucien Febvre : 1878-1956) এবং মার্ক ব্লখ্‌ (Marc Bloch: 1886-1944) মানুষের সামাজিক অস্তিত্বের বিচিত্ররূপকে প্রথম ধরতে চাইলেন ইতিহাসের সীমায়। ভূগোল ও সামাজিক মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তাঁরা ইতিহাসের ব্যাপকতর বিশ্লেষণ করতে অগ্রসর হলেন। তাঁরা সাহায্য নিলেন জ্ঞানতত্ত্বের বহু বিচিত্র শাখার গবেষক ও তাঁদের উত্তরসূরী ফার্নান্দ ব্রদেল-এর (Fernand Braudel : 1902-83)। সামাজিক কাঠামোকে একদিকে কালের দীর্ঘস্থায়ী বা চিরন্তন এককে এবং অন্যদিকে তার দ্রুতগতিসম্পন্ন একক ও সেই এককের পরিবর্তমানতাকে নিয়ে আলোচনা করেছেন এঁরা।

পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাসের গর্ভেই জ্ঞানদীপ্তির যে সমালোচনা নিহিত ছিল, তা আজকের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যে নীটৎসে-কে (Nitzsche, Karl Wilhelm : 1818-80) একদিন ফ্যাসিবাদের বৌদ্ধিক জন্মদাতা বলে অভিযোগ উঠেছিল তাঁকেই এখন গভীরতর চর্চার বিষয় বলে ভাবা হচ্ছে। যুক্তির গঠিত যাত্রাপথই নয়। অযুক্তির পথও একটা পথ। এই বিকল্প গমন ধরেও অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। জ্ঞানতত্ত্বকে ক্ষমতার হাতিয়ার রূপে উপস্থাপিত করেছেন মিশেল ফুকো (Michel Foucault : 1926-85)। সংক্ষেপে, তাঁর অন্যতম প্রধান বক্তব্য হল জ্ঞানচর্চা তথা ইতিহাসচর্চা ক্ষমতা বিস্তার এবং ক্ষমতা সংহতিকরণের হাতিয়ার রূপেই কাজ করেছিল। জ্ঞান ও সভ্যতা মানুষকে তাঁর আদিম প্রকৃতি ও চরিত্র থেকে বিযুক্ত করে ক্রমশ বিকৃতির দিকে ঠেলে দেয়।

ক্ষমতার দিক থেকে, ক্ষমতাবানের দিক থেকে না দেখে ইতিহাসকে দেখা যাক নীরব ব্রাত্যজনের দিক থেকে, অবহেলিতা নারীর দিক থেকে, শোষিত নিম্নবর্গের দিক থেকে। দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চার কেন্দ্র পরিবর্তিত হওয়ার ফলে সম্প্রতি ইতিহাসে অনেক নতুন নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনও ইতিহাসের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্ক, আমাদের রন্ধনবিদ্যা, আমাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার সবই আজ ইতিহাস-আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

মানুষের সচেতন মনের গভীরে যে অজানা, অদেখা জগত পড়ে আছে— যেখানে হয়তো গুঁড়ি মেরে বসে আছে অনেক অন্ধবিশ্বাস ও আদিমতা, সেখানেও আজ ঐতিহাসিক হাত বাড়িয়েছেন। শিক্ষা-দীক্ষায় প্রচণ্ড আধুনিক যুক্তিবাদীর মনের গোপনে নিহিত থাকতে পারে আদিম প্রবণতা ও প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আসক্তি। সেই চরিত্র হঠাৎ-ই কোনো সূক্ষ্মস্পর্শে অণুরণিত হয়ে ওঠে। কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের বিচরণের জগত আজ ঐতিহাসিকেরও পদধূলিতে সরব।

এর সঙ্গেই প্রসঙ্গত জড়িয়ে আছে মনোভঙ্গির ইতিহাস (History of mentalite)।

আগেকার বুদ্ধি-কেন্দ্রিক ইতিহাস বা চিন্তার ইতিহাসে প্রধানত প্রথাগত চিন্তাপ্রণালী বা চিন্তা-ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করা হত। আজ মনোভঙ্গির ইতিহাসে অর্ধশিক্ষিত বা নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মনোভাব-প্রকাশের ক্ষেত্রগুলিও চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ফলে বিচিত্র নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে। যেমন, ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফরাসী জনগণের মনোভঙ্গি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে দেশবাসীর মনোভঙ্গির পরিবর্তন হতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। অনেক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল বিপ্লবের বার্তা এসেছিল পুরাতনতান্ত্রিক প্রতীক ও বিশ্বাসের মাধ্যমে, ধর্মীয় প্রচারের মাধ্যমে এবং ভাষা ও প্রবাদের মাধ্যমে।

সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদীরা দাবি করেছেন— শুদ্ধ পাশ্চাত্য উদারনৈতিক প্রতিষ্ঠান-গুলির দিক থেকে নয়, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দিক থেকে, কৌমজীবন ও কৌমচেতনার দিক থেকেও ইতিহাসকে ভেবে দেখা উচিত। তবেই জ্ঞানদীপ্তি তথা আধুনিকতার একমাত্রিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে বহুরঞ্জিত এক বর্ণোজ্জ্বল ছবি জেগে উঠবে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ং ইতিহাসের অস্তিত্ব নিয়েই মৌলিক প্রশ্ন উঠেছে। সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে-পড়ার ফলে এবং ঠাণ্ডা লড়াই-এর পরিসমাপ্তি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে মতাদর্শগত বিরোধ তথা মতাদর্শগত আন্দোলনের প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। তার সঙ্গে ফুরিয়েছে ইতিহাসের প্রয়োজনও। এখন ভোগবাদী মানুষের প্রয়োজন কেবল প্রযুক্তিগত ও ব্যবহারগত সুযোগ-সুবিধাগুলি। ইতিহাস এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে সংরক্ষণশালার ঠাণ্ডা যাদুঘরে।

অর্থাৎ প্রচলিত ও প্রথাসিদ্ধ ইতিহাসকে এই যুগে বহুমুখী আক্রমণের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যেমন, সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদের দিক থেকে, জ্ঞানদীপ্তির বিরুদ্ধ-সমালোচনার দিক থেকে, ক্ষমতার দর্শনের দিক থেকে, নিম্নবর্গের দিক থেকে, ব্রাত্যজনের দিক থেকে, নিতান্ত ব্যক্তিগত দিক থেকে এবং ইতিহাস-বিরোধিতার দিক থেকে। এখন প্রশ্ন হল ইতিহাস পঠন-পাঠন কি পূর্ব নির্ধারিত বিমূর্ততার ছকেই আটকে থাকবে, নাকি তাকে সরাসরি বিমূর্ততার বিভিন্ন মাত্রার সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে যুক্ত হতে হবে জ্ঞানের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের সঙ্গে? উত্তর এই যে তথ্যনির্ভর, দলিল-দস্তাবেজ বিশ্লেষণকারী যে-ইতিহাসকে আমরা এতদিন সম্মান করে এসেছি, তাকে ক্রমে মানবজীবনের বহু সূক্ষ্ম ও জটিল প্রশ্নের কথা ভেবে দেখতে হবে। □